নির্বাচন কমিশন সংস্কারের জন্য যা প্রয়োজন

ড. বদিউল আলম মজুমদার, সম্পাদক, সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক (১৫ নভেম্বর ২০০৬)

সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে নির্বাচন কমিশন সংস্কারের দাবি আজ প্রায় সার্বজনীন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। কিন্তু সংস্কারের বিষয়টি আজ যেন নির্বাচন কমিশনের পুনর্গঠনের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়ে গেছে। বহু সাধারণ নাগরিকের মতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি এম এ আজিজের পদত্যাগই সমস্যার সমাধান। অনেকের কাছে বিচারপতি আজিজসহ চার কমিশনারদের বাদ দিয়ে নতুন কয়েকজন কমিশনার নিয়োগ করলেই নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠিত হবে। আবার কমিশনে নতুন কয়েকজনকে নিয়োগ দিয়ে কমিশনারদের সংখ্যা বাড়ানোর দাবি করছেন অনেকে। অনেক চিন্তাশীল নাগরিকের মতে, ব্যক্তির পরিবর্তনের সাথে সাথে কতগুলো মৌলিক সংস্কার, নির্বাচন কমিশন সংস্কারের অন্তর্ভুক্ত হওয়া আবশ্যক। নির্বাচন কমিশনের সংস্কারের দাবিকে আরো সুস্পষ্ট ও এ বিষয়ে বিভ্রান্তি দূর করার লক্ষ্যেই এই নিবন্ধ।

নির্বাচন কমিশন সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা

নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী এর সৃষ্টি। যথাসময়ে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান কমিশনের দায়িত্ব। আর সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত। ফলে নির্বাচন কমিশনের কার্যকারিতার ওপর গণতন্ত্রের সফলতা বহুলাংশে নির্ভর করে। তাই নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীন, শক্তিশালী ও কার্যকর করার কোন বিকল্প নেই।

২০০৪ সালে 'সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক' গণমাধ্যমের সহায়তায় নির্বাচন কমিশন সংস্কারের প্রস্তাব আনুষ্ঠানিকভাবে উত্থাপন করে। সে সময়ে সরকার ও প্রধান বিরোধী দল মূলত লিপ্ত ছিল একমাত্র তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সংস্কার– অর্থাৎ বিচারপতি কে এম হাসানকে বাদ দেয়া-না দেয়ার বিতণ্ডায়। আনন্দের কথা যে, বিরোধী ১৪-দল পরবর্তীতে নির্বাচন কমিশনের সংস্কারকে তাদের অন্যতম দাবিতে পরিণত করেছে।

নির্বাচন কমিশনের সমস্যাগুলোকে মূলত তিন ভাগে বিভাজন করা যায়। প্রথমত, ব্যক্তির সমস্যা। দ্বিতীয়ত, পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা। তৃতীয়ত, কমিশনের সামর্থ্যের অভাব।

নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ ও কমিশনারদের নিরপেক্ষতার প্রশ্ন নিয়ে বহুদিন থেকেই আমাদের দেশে বিতর্ক চলে আসছে। এ বিতর্কের একটি বড় কারণ হলো যে, ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলগুলো সর্বদাই বিরোধী দলের সাথে আলাপ-আলোচনা না করেই একতরফাভাবে কমিশনারদের নিয়োগ প্রদান করে আসছে। এ সকল নিয়োগ অনেকক্ষেত্রে ছিল দলীয় প্রভাবদুষ্ট। নির্বাচন কমিশনের বর্তমান চার সদস্যের যোগ্যতা, তাদের নিয়োগের স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিয়ে বিতর্ক এখন সকল সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে। কমিশনকে নিয়ে জনমনে ব্যাপক আস্থাহীনতা বিরাজ করছে। বস্তুত নির্বাচন কমিশনে যেন আজ একটি ধারাবাহিক নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে এবং কমিশনারগণ, বিশেষত প্রধান নির্বাচন কমিশনার এর খলনায়কে পরিণত হয়েছেন। নির্বাচন কমিশনের অনেক কর্মকর্তার বিরুদ্ধেও দলবাজি ও অসততার গুরুতর অভিযোগ রয়েছে।

পদ্ধতিগত সীমাবদ্ধতা নির্বাচন কমিশনের দুর্বলতার অন্যতম কারণ। নির্বাচন কমিশনের সচিবালয়ের ওপর কমিশনের পূর্ণ কর্তৃত্ব নেই। বস্তুত কমিশনের সচিবালয় সরকার বা প্রধানমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণাধীন। তাই কমিশনকে তার কাজের জন্য সরকারের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করতে হয়। এছাড়াও কমিশনের বাজেটও সরকারের অনুগ্রহের ওপর নির্ভরশীল। এ সকল কারণে নির্বাচন কমিশন একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠতে পারে নি।

আমাদের নির্বাচন কমিশনের একটি বড় সমস্যা হলো বিদ্যমান আইনের প্রয়োগ ও ক্ষমতা ব্যবহারের অসমর্থতা। সংবিধান, *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ* ১৯৭২, *ভোটার তালিকা অধ্যাদেশ* ১৯৮২ প্রভৃতি আইনে নির্বাচন কমিশনকে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। নিম্নের ক্ষমতাগুলো যার অন্যতম:

- *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ* ১৯৮২-এর ১২(১)(বি) অনুযায়ী, সরকারের সাথে ঠিকাদারী, মালামাল সরবরাহ অথবা কোন সেবা প্রদানের ব্যবসায়িক সম্পর্ক থাকলে তিনি সংসদ সদস্যপদে নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য হবেন না। এছাড়া ঋণ খেলাপের দায়ে প্রার্থীতা বাতিলের এখতিয়ারও কমিশনে রয়েছে।
- *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ* ১৯৭২-এর ৪৪(সি) ও ৪৪(সিসিসি) অনুযায়ী, সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রার্থী নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার ১৫ দিনের মধ্যে রিটার্নিং অফিসারের নিকট এবং প্রার্থী মনোনয়নকারী রাজনৈতিক দল ৬০ দিনের মধ্যে নির্বাচনী ব্যায়ের হিসাব নির্দিষ্ট ছকে দাখিল করবে। কিন্তু কোন রাজনৈতিক দলই নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব এ পর্যন্ত জমা দেয় নি। গত সংসদ নির্বাচনের পর অনেক প্রার্থীই ব্যয় হিসাব দাখিল করেন নি। যেমন, ২০০১ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী ১,৯৩৯ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৫৮৭ জন ফরম ১৭এ ও ১৭বি এবং ১৪৭৩ জন ফরম ১৭সি পূরণ করে জমা দেন। এ সকল তথ্য জমা না দিলে আইনে ২-৭ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে। কিন্তু এ বিধান লংঘনের কারণে কমিশন কোন দল বা প্রার্থীর বিরুদ্ধে কোনরূপ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

- নির্বাচনে টাকার অযাচিত প্রভাব দূর করা নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব। *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ* নির্বাচন কমিশনকে এ ক্ষমতা সুস্পষ্টভাবে দিয়েছে, যা পালনে কমিশন কোনরূপ কার্যকারিতা প্রদর্শন করতে পারে নি। যেমন, বর্তমানে তোরণ নির্মাণ, রঙ্গিন পোষ্টারের ছড়াছড়ি, দেয়াল লিখন, বিশেষত শো-ডাউনের মাধ্যমে যে বেআইনি টাকার খেলা চলছে তা বন্ধ করার ব্যাপারে আমাদের নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণ নির্বিকার অথচ এসব সম্পূর্ণ বেআইনি। দেশে একটি নির্বাচন কমিশন এবং এর কোন কার্যক্রম আছে কি না তা প্রতি সকালের সংবাদপত্র না পড়লে বা সন্ধ্যার টেলিভিশনের খবর না দেখলে বোঝা দুরূহ।
- গত ২৪ মে ২০০৫ তারিখে হাইকোর্ট একটি যুগান্তকারী রায়ে সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের জীবনবৃত্তান্ত সম্পর্কীত ৮ ধরনের তথ্য হলফনামার আকারে মনোনয়নপত্রের সাথে জমা দেয়ার বিধান বাধ্যতামূলক করেছেন। আদালত নির্বাচন কমিশনকে এ্ সকল তথ্য সংগ্রহ করে গণমাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে ভোটারদের অবগত করার নির্দেশ দেন। দুর্ভাগ্যবশত নির্বাচন কমিশন এ রায় পরিপূর্ণ ও যথাযথভাবে বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়েছে। শুধু তাই নয়, আমাদের প্রধান নির্বাচন কমিশনার দাবি করেছেন যে, যেহেতু রায়ে কোন শাস্তির বিধান নেই, তাই এটি ঐচ্ছিক, বাধ্যতামূলক নয়। অনেক আইনজ্ঞের মতে, তার এ ব্যাখ্যা সঠিক নয়। উল্লেখ্য যে, ২০০৩ সালে প্রতিবেশী ভারতে শাস্তির বিধান ছাড়াই ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট এইরূপ একটি রায় প্রদান করেন এবং কোনরূপ ওজর-আপত্তি না করেই, এমনকি আইন মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে নির্বাচনী বিধি পরিবর্তনের অস্বীকৃতি সত্ত্বেও নির্বাচন কমিশন রায়টি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করেন। কিন্তু আমাদের নির্বাচন কমিশন এ ব্যাপারে জনস্বার্থ রক্ষা করতে নগ্নভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। (উল্লেখ্য যে, সুজনের উদ্যোগে ২০ জুলাই ২০০৫ সালে অনুষ্ঠিত সুনামগঞ্জ-৩ আসনের উপনির্বাচনের প্রাক্কালে (১৭ জুলাই ২০০৫) নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের রায় যথাযথভাবে বাস্তবায়ন না করায় জনস্বার্থে একটি মামলা দায়ের করা হয়। হাইকোর্ট প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ নির্বাচন কমিশনের প্রতি রুল নিশি জারি করলেও অদ্যবধি মামলার শুনানি করানো সম্ভব হয় নি। তবে হাইকোর্টের রায়ের প্রেক্ষিতে 'সুজন' নিজস্ব উদ্যোগেই প্রার্থীগণ কর্তৃক পেশকৃত হলফনামায় প্রদত্ত তথ্য ও তথ্যের অসঙ্গতিসমূহ ভোটারদের অবগত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে সম্ভাব্য প্রার্থীদের থেকে তথ্য সংগ্রহের উদ্যোগ নিয়েছে। দেখুন www.shujan.org) এছাড়াও আমাদের *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে*'র ৪৪(এএ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের সম্পদ, দায়-দেনা, আয়-ব্যয়ের তথ্য ও আয়কর রিটার্ন রিটার্নিং অফিসারের কাছে জমা দেয়া বাধ্যতামূলক এবং যে কোন ব্যক্তি এ সকল তথ্য নির্দিষ্ট ফি-এর বিনিময়ে পেতে পারে। কিন্তু 'সুজনে'র পক্ষ থেকে বারবার অনুরোধ জানিয়েও আমরা গত ৫টি উপনির্বাচনে অংশহণকারী প্রার্থীদের দেয়া তথ্য পাই নি। এমন কি কমিশন এবং সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারগণ আমাদের চিঠির উত্তর প্রদানের সৌজন্যবোধটুকুও প্রদর্শন করেন নি।
- *নির্বাচনী সীমা নির্ধারণ অধ্যাদেশ* ১৯৭৬ নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচনী এলাকার সীমা নির্ধারণের দায়িত্ব প্রদান করেছে। কিন্তু এ দায়িত্বটি কমিশন যথাযথভাবে পালন করছে না। উদাহরণসরূপ, ২০০১ সালের জনমিতি প্রকাশের পর কমিশন সীমানা নির্ধারণের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করে নি। ফলে বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকায় ভোটার সংখ্যার ব্যাপক তারতম্য বিরাজমান, যা 'এক ব্যক্তি এক ভোট' নীতির পরিপন্থি।
- *ভোটার তালিকা অধ্যাদেশ ১৯৮২* অনুযায়ী, প্রত্যেক ভোটারকে ছবিসহ পরিচয়পত্র প্রদান নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব। কিন্তু এ দায়িত্ব পালনে কমিশন শুধু ব্যর্থই হন নি, "আইডি কার্ড প্রকল্পের" জন্য প্রদত্ত বিদেশী সাহায্যের কোটি কোটি টাকা লুটপাট হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।
- সংবিধানে নির্বাচন কমিশনকে স্থানীয় সরকার ব্যতীত সকল নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এ ক্ষমতা ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। ***আলতাফ হোসেন বনাম আবুল কাশেম*** মামলার রায়ে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে: "সংবিধানের ১১৯ অনুচ্ছেদের 'তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণে'র অন্তঃস্থায়ী ক্ষমতা (inherent power) অনুযায়ী সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে আইনি বিধানের সাথে সংযোগ করার অধিকার নির্বাচন কমিশনের রয়েছে (45DLR(AD)(1993))।
- সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য যথাযথ পরিবেশ সৃষ্টি করা আবশ্যক। সন্ত্রাসীরা, বিশেষত রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় লালিত দুস্কৃতিকারীরা নির্বাচনী পরিবেশ বিনষ্ট এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচনে বিঘ্ন সৃষ্টি করে থাকে। নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর প্রশাসনিক যন্ত্রকে কমিশনের নিয়ন্ত্রণে আনা হয় যাতে কমিশন নির্বাচনের জন্য যথাযথ অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু আমাদের কমিশন এ ক্ষমতা প্রয়োগে পুরোপুরি ব্যর্থ। অথচ এর বিপরীত দৃষ্টান্তও রয়েছে। যেমন ভারতীয় নির্বাচন কমিশন বিহারের সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনের পূর্বে ১,৪০,০০০ দাগী আসামীকে জেলে অন্তরীণ করার ব্যবস্থা করে। ফলে এবারই প্রথমবারের মত বিহারে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব হয়েছে এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত দলগুলোর নির্বাচনে ভরাডুবি হয়েছে।
- নির্বাচনের সময়ে প্রার্থীগণকে নির্বাচনী আচরণ বিধি মেনে চলা বাধ্যতামূলক। খুব কম প্রার্থীই তা মেনে চলেন। কিন্তু আমাদের নির্বাচন কমিশন এ ব্যাপারে প্রায় সম্পূর্ণ নির্বিকার।
- *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ* ১৯৭২-এ আমাদের নির্বাচন কমিশনকে বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। এ ক্ষমতা ব্যবহার করে কমিশন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে পারেন। যেমন, তারা ব্যালট পেপারে পরিবর্তন এনে 'না' ভোটের বিধানও করতে পারেন বলে অনেকের ধারণা। কিন্তু আমাদের নির্বাচন কমিশন এক্ষেত্রে কোন সক্রিয় ভূমিকা প্রদর্শন করেন নি। উল্লেখ্য যে, ভারতের নির্বাচন কমিশনের এমন ক্ষমতা নেই, ফলে তাদেরকে বিধি প্রণয়নের জন্য আইন মন্ত্রণালয়ের ওপর নির্ভর করতে হয়।

দুর্ভাগ্যবশত আমাদের কমিশন উপরিউক্ত ক্ষমতাগুলো যথাযথভাবে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছে। এ ব্যর্থতার প্রধান কারণ হলো কমিশনের সাথে সংশ্লিষ্ট অনেকের অযোগ্যতা ও দৃঢ়চিত্ততার অভাব এবং পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ। সদিচ্ছা প্রদর্শন করলে কমিশনের পক্ষে একটি কার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়া সম্ভব হত।

নির্বাচন কমিশন সংস্কারের জন্য করণীয়

ব্যক্তির বদল

নির্বাচন কমিশনকে পুর্নগঠনের মাধ্যমে স্বাধীন ও শক্তিশালী করতে হলে প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ বর্তমান কমিশনারদের পদত্যাগের কোন বিকল্প নেই। তারা জনগণের আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন। তাদেরকে রেখে এবং বর্তমানে কমিশনে কর্মরত ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অনেকের নিয়ন্ত্রণে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে এর ফলাফল নিয়ে জনমনে প্রশ্ন থেকে যাবে। তাই সাংবিধানিক জটিলতা ও অশুভ দৃষ্টান্ত সৃষ্টির ঝুঁকি সত্ত্বেও কমিশনারদেরকে স্বেচ্ছায় সরে দাঁড়ানোর জন্য রাজি করাতে হবে। তারা রাজী হলে সৎ, যোগ্য, নির্ভিক ও নির্লোভ ব্যক্তিদেরকে কমিশনে মনোনয়ন প্রদানের ব্যবস্থা নিতে হবে।

কমিশনারগণ নিজেরা পদত্যাগ না করলে বিকল্প পন্থা খুঁজতে হবে। একটি পন্থা হলো, সংবিধানের ৯৬(৫) অনুচ্ছেদের আওতায় সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠন করে তাদের সম্পর্কে তদন্ত করা। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে আরো দু'জন কর্মে প্রবীণ বিচারপতির সমন্বয়ে গঠিত কাউন্সিল তদন্ত করে কমিশনারগণ শারিরিক বা মানসিক অসমর্থের কারণে তাদের পদের দায়িত্ব পালনে অযোগ্য হয়ে পড়েছেন অথবা গুরুতর অসদাচরণের জন্য দোষী হয়েছেন বলে রিপোর্ট প্রদান করলে রাষ্ট্রপতি তাদেরকে অপসারণ করতে পারবেন।

সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল অনেকগুলো বিষয় খতিয়ে দেখতে পারেন। আমাদের বর্তমান প্রধান নির্বাচন কমিশনার ভোটার তালিকা অধ্যাদেশের ৭(৭) অনুচ্ছেদ অমান্য ও পরবর্তীতে হাইকোর্টের ৪ জানুয়ারী ২০০৬ তারিখের রায় উপেক্ষা করে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন ভোটার তালিকা প্রণয়ন করেছেন, যা সুপ্রীম কোর্ট বাতিল করে দিয়েছে। এ পদক্ষেপের মাধ্যমে তিনি আইন ও আদালতের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন এবং একইসাথে জনস্বার্থও রক্ষার দায়িত্ব পালন (fiduciary responsibility) করতে ব্যর্থ হয়েছেন। ভোটার তালিকা সংশোধনের ব্যাপারে বর্তমান কমিশন সুপ্রীম কোর্টের রায় পরিপূর্ণভাবে মেনেছেন কি না তা নিয়েও গুরুতর প্রশ্ন রয়েছে, কারণ কমিশন খসড়া ভোটার তালিকা প্রস্তুত করেন নি। এছাড়াও গত জুলাই মাসে প্রকাশিত তাদের সংশোধিত ভোটার তালিকা ভুল-ভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ বলেও গণমাধ্যমে রিপোর্ট বেরিয়েছে। তাই কমিশন সঠিক ভোটার তালিকা প্রণয়নের সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন বলে অনেকের ধারণা। নিঃসন্দেহে কমিশন ভোটার তালিকা অধ্যাদেশের ১১(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রত্যেক নির্বাচনের প্রাক্কালে তথ্য সংগ্রহকারীদের বাড়ি বাড়ি পাঠিয়ে তথ্য সংগ্রহ করে খসড়া ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও পরবর্তীতে উপরিউক্ত তালিকা সংশোধন ও চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রণয়নের বিধানও অমান্য করেছেন। আদালতের রায় অনুযায়ী, কমিশন প্রার্থীদের সম্পর্কে ভোটারদের সঠিক তথ্য দিয়ে ক্ষমতায়িত ও তাদের স্বার্থ রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এছাড়াও সংবাদপত্রের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, আমাদের মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিদেশী প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাত এড়াতে অসুস্থতার সন্দেহজনক "অজুহাত" দেখিয়েছেন। সর্বোপরি, তার পদত্যাগের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির অনুরোধ সম্পর্কে অসত্য বলেছেন। পুরো জাতির কাছে এই অসত্য কথা বলা অসদাচরণের সংজ্ঞায় পড়বে কি না তা আইনজ্ঞরাই ভাল বলতে পারবেন। তবে উপরিউক্ত কারণে কমিশনের সদস্যদের অনেকেরই যোগ্যতা ও আচরণ সম্পর্কে জনমনে গুরুতর প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

বিচারপতি আজিজ ও বিচারপতি মাহফুজুর রহমানের নির্বাচন কমিশনের সদস্যপদ সংবিধান সম্মত কি না তা নিয়েও সাম্প্রতিককালে প্রশ্ন উঠেছে। আমাদের সংবিধানের ৯৯(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, "... কোন ব্যক্তি ... বিচারক পদে দায়িত্ব পালন করিয়া থাকিলে উক্ত পদ হইতে অবসর গ্রহণের কিংবা অপসারিত হইবার পর তিনি কোন ... বিচার বিভাগীয় বা আধা বিচার বিভাগীয় পদ অথবা প্রধান উপদেষ্টা বা উপদেষ্টার পদ ব্যতীত প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোন লাভজনক পদে বহাল হইবেন না।" ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টের মতে, "নির্বাচন কমিশনের কাজ মূলত প্রশাসনিক, যদিও কমিশনকে কিছু ক্ষেত্রে বিচারিক (adjudicative) ও আইন প্রণয়নমূলক (legislative) দায়িত্ব পালন করতে হয়" ((১৯৯৫) ৪ SEC))। বিচারপতি মাহফুজুর রহমানের কমিশনে নিয়োগের পর গত বছর বর্তমান লেখক সংবিধানের এই অনুচ্ছেদের আলোকে তার নিয়োগের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল (দি ডেইলি স্টার, ৮ জন ২০০৬; দৈনিক ইত্তেফাক, ৪ জুলাই ২০০৬)। সাম্প্রতিককালে কয়েকজন আইনজ্ঞ – ড. শাহদীন মালিক, ড. আসিফ নজরুল ও ড. বোরহান উদ্দীন খান – বিচারপতি আজিজকে নিয়েও একই সাংবিধানিক প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। সংবিধানের এই অনুচ্ছেদ বিচারপতি আজিজ ও বিচারপতি রহমানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কি না সে ব্যাপারে সন্দেহ থাকলে রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টের মতামত গ্রহণ করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারেন। তবে অনেক আইনবিদদের মতে, অবসরপ্রাপ্ত কিংবা অপসারিত বিচারপতিদের প্রজাতন্ত্রের কোন লাভজনক পদেই নিয়োগ পাওয়া সমীচিন নয়, কারণ বিচার বিভাগের ওপর এর গুরুতর বিরূপ প্রভাব পড়ে।

নির্বাচন কমিশনের বর্তমান অচল অবস্থা দূরীকরণের লক্ষ্যে কেউ কেউ আরও কয়েকজন নতুন কমিশনার নিয়োগ প্রদানের প্রস্তাব করছেন। এ প্রস্তাবের তাৎপর্য গভীরভাবে ভেবে দেখা আবশ্যক। আমাদের আশংকা, এর ফলে কমিশন একটি নগ্ন দলাদলির স্থানে

পরিণত হতে পারে এবং এটির প্রতি জনগণের শ্রদ্ধাবোধ আরো কমে যেতে পারে। এছাড়াও এ ব্যবস্থা নির্বাচন কমিশনের অসততা, অযোগ্যতা ও অদক্ষতার সমস্যার কার্যকর সমাধান নয় – বরং এটি দুরারোগ্য ক্যান্সারের চিকিৎসার জন্য ব্যাণ্ডেজ লাগানোর সমতুল্য।

ভবিষ্যতে নির্বাচন কমিশনে মনোনয়নের সমস্যাটিরও সমাধান প্রয়োজন। তবে এর জন্য সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন হবে। আমাদের প্রস্তাব হলো যে, রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলীয় নেত্রী, জাতীয় সংসদের স্পীকার, প্রধান বিচারপতি, অডিটর জেনারেল ও ন্যায়পাল সমন্বয়ে গঠিত কমিটি সকল সাংবিধানিক পদে মনোনয়ন চূড়ান্ত করবেন এবং রাষ্ট্রপতি নিয়োগ প্রদান করবেন। এছাড়াও সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে কমিশনারদের সংখ্যা ও তাদের যোগ্যতা নির্ধারণ করা যেতে পারে। সংবিধান সংশোধন করে সমস্যাগুলোর সকল আনুসাঙ্গিক সমস্যার স্থায়ী সমাধান না করলে, ভবিষ্যতেও সমস্যাগুলোর পুনরাবৃত্তি ঘটতেই থাকবে বলে আমাদের আশংকা।

প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সীমাবদ্ধতা দূরীকরণ

নির্বাচন কমিশনের বর্তমান কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা দূর করার জন্য কতগুলো পদ্ধতির সংস্কার প্রয়োজন। সুস্পষ্টভাবে আমরা প্রস্তাব করছি যে, কমিশনকে যেন সরকার বা প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করা হয়। একইসাথে কমিশনের নিজস্ব সচিবালয় ও লোকবলের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এছাড়াও সংবিধানের ৮৮(গ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, কমিশনের ব্যয় সংযুক্ত তহবিলের ওপর দায়মুক্ত ব্যয় হিসেবে গণ্য করা আবশ্যক, যা বর্তমানে উপেক্ষিত। কমিশনের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জনস্বার্থ জড়িত আছে এমন সব সিদ্ধান্ত প্রকাশ্য সভায় গ্রহণের বিধান করা জরুরি। কমিশনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য এর কার্যক্রম সম্পর্কে সংসদে আলোচনা করারও বিধান করা যেতে পারে। এছাড়াও কমিশনের জন্য একটি আচরণবিধিও প্রণয়ন করা যেতে পারে।

আমাদের গণতান্ত্রিক পদ্ধতির আজকের সংকটের অন্যতম কারণ রাজনৈতিক দলের ও তাদের মনোনীত প্রার্থীদের অসদাচারণ। রাজনৈতিক দল গণতন্ত্রের চালিকাশক্তি। গণতান্ত্রিক, আর্থিক স্বচ্ছতা সম্পন্ন ও দায়বদ্ধ রাজনৈতিক দল ছাড়া গণতন্ত্র কার্যকর হতে পারে না। কিন্তু আমাদের দেশে সত্যিকার অর্থে এমন রাজনৈতিক দল আজও গড়ে ওঠে নি। আমাদের দলগুলো এখন কালোটাকার মালিক, পেশীশক্তির অধিকারী, দখলদার, দুর্নীতিবাজ, ঋণখেলাপী তথা দুর্বৃত্তদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। এগুলো বর্তমানে ছলে-বলে-কলে-কৌশলে ক্ষমতায় যাওয়ার ও ফায়দা দেয়া-নেয়ার সিণ্ডিকেটে পরিণত হয়েছে। দুর্বৃত্তদের দৌরাত্মে ভালো লোকরা ক্রমাগতভাবে রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে বিতাড়িত হচ্ছেন। এছাড়াও সৎ ব্যক্তিরা রাজনীতিতে এলেও তারা অসৎ ও দুর্নীতিবাজে পরিণত হচ্ছেন। এ অবস্থা চলতে থাকলে আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুরোপুরি অকার্যকর হতে বাধ্য। কিন্তু আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো স্ব-প্রণোদিত হয়ে এ অবস্থার পরিবর্তন আনবে না। তাই নির্বাচন কমিশনের অধীনে রাজনৈতিক দলগুলোর বাধ্যতামূলক নিবন্ধনের বিধান করা আবশ্যক। নিবন্ধনের শর্ত হওয়া উচিত দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র চর্চা, দলের কার্যক্রমের ও আর্থিক স্বচ্ছতা এবং দলের মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় সংস্কার। রাজনৈতিক দলের বাধ্যতামূলক নিবন্ধনের জন্য গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের ৯০(এ) অনুচ্ছেদে পরিবর্তন এনে কমিশনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা আজ জরুরি।

রাজনৈতিক দলগুলো যে যথেচ্ছাচারে লিপ্ত হওয়ার লাইসেন্স চায় তার একটি দৃষ্টান্ত মিলে ২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালের একটি ঘটনা থেকে। রাষ্ট্রপতি ৮ আগস্ট ২০০১ তারিখে একটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের ৯১ অনুচ্ছেদে নতুন একটি, ৯১(ডি), উপানুচ্ছেদ সংযোজন করেন। এই উপানুচ্ছেদ নির্বাচন কমিশনকে গুরুতর অসদাচরণ ও বেআইনি কাজের দায়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারীদের প্রার্থীতা বাতিলের ক্ষমতা প্রদান করে। যতদূর জানা যায়, প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো একত্রিত হয়ে রাষ্ট্রপতির ওপর চাপ সৃষ্টি করে আরেকটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে বিধানটি পরবর্তিতে বাতিল করার ব্যবস্থা করে। নির্বাচন কমিশনের কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এটির পুনঃসংযোজন আবশ্যক।

আমরা বিশ্বাস করি যে, নির্বাচন কমিশনের কাঠামোর বিদ্যমান পদ্ধতি ও কাঠামোগত সীমাবদ্ধতাগুলো দূরীভূত করলে কমিশনের সামর্থ বৃদ্ধির পথ সুগম হবে। একইসাথে সৎ, যোগ্য, নির্লোভ ও নির্ভিক ব্যক্তিদেরকে কমিশনে নিয়োগ প্রদান করলে এবং কমিশনের স্বাধীন সচিবালয় প্রতিষ্ঠিত হলেও এর প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য বাড়বে। এই সামর্থ্য বৃদ্ধির ওপরই ভবিষ্যতে কমিশনের কার্যকারিতা নির্ভর করবে।

পরিশেষে, এটি সুস্পষ্ট যে, নির্বাচন কমিশন একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। এর শক্তি, স্বাধীনতা, বলিষ্ঠতা ও কার্যকারিতার ওপর গণতন্ত্রের সফলতা বহুলাংশে নির্ভরশীল। কিন্তু আমাদের গণতান্ত্রিক পদ্ধতি আজ চরম হুমকির সম্মুখীন। এর অন্যতম কারণ হলো আমাদের নির্বাচন কমিশনের বর্তমান বেহাল অবস্থা। স্বার্থান্বেষী ও অযোগ্য ব্যক্তিদের মনোনয়ন এবং পদ্ধতিগত সীমাবদ্ধতার কারণে আমাদের নির্বাচন কমিশন আজ একটি অকার্যকর ও গণবিরোধী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। নির্বাচন কমিশনই যেন আজ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এজন্য অবশ্যই বর্তমান নির্বাচন কমিশনারদের বাদ দেয়ার পন্থা খুঁজে বের করতে হবে। তবে নির্বাচন কমিশনকে একটি যথার্থ ও কার্যকর গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্য ব্যক্তিকে বাদ দেয়াই যথেষ্ট নয়। একইসাথে প্রয়োজন হবে নির্বাচন কমিশনের পদ্ধতিগত কাঠামোর দুর্বলতা নিরসন এবং এর প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য বৃদ্ধি। আরো প্রয়োজন হবে রাজনৈতিক দলের সংস্কার। একটি সামগ্রিক সংস্কার কর্মসূচী নিয়ে আজ অগ্রসর না হলে সবই পণ্ডশ্রমে পরিণত হতে পারে।

(১৬ নভেম্বর ২০০৬ তারিখে 'সুজন' ও 'রিপোর্টার্স ফোরাম ফর ইলেকশন এন্ড ডেমোক্রেসী'-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত "নির্বাচন কমিশনের সংস্কারের জন্য যা প্রয়োজন" শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে উত্থাপিত।)